

আল-ফিকহুল আকবর

বিভাগ/অধ্যায়ঃ ইসমাতুল আম্মিয়া, সাহাবায়ে কেরাম, তাকফীর, সুন্নাহ ও ইমামাত
রচয়িতা/সঙ্কলকঃ ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর (রহ.)

৪. ৩. সাহাবীগণ বিষয়ে কুরআন ও সুন্নাহ

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)–এর পরিজন ও বংশধরের প্রতি এ ভালবাসা ও ভক্তি কখনোই তাঁর সহচর ও সাহাবীগণের প্রতি ভালবাসার সাথে সাংঘর্ষিক নয়। কিন্তু শীয়াগণ পরিবার ও বংশধরের ভালবাসার নামে সাহাবীগণের প্রতি বিদ্বেষ, ঘৃণা ও কুৎসা রটনায় লিপ্ত হয় এবং সাহাবীগণের প্রতি বিদ্বেষকে ঈমানের অংশ বানিয়ে নেয়। তারা ইহুদীদের ষড়যন্ত্রে বিভ্রান্ত হয়ে সাহাবীগণকে ইসলামের শত্রু বলে গণ্য করে। তারা নবী-পরিবারের ভালবাসাকে সাহাবীগণের ভালবাসার পরিপন্থী বলে গণ্য করে। এ বিষয়ে অগণিত মিথ্যা তারা প্রচার করে। গত কয়েক শতাব্দী যাবত পাশ্চাত্য-প্রাচ্যবিদগণও সাহাবীগণের বিরুদ্ধে বিষোদগার করেন। এ সকল প্রচারের একটিই উদ্দেশ্যঃ ইসলামের মর্মমূলে আঘাত করা ও ইসলামের সৌধকে ভেঙ্গে ফেলা। সাহাবীগণের সততা প্রশ্নবিদ্ধ হলে ইসলামের সত্যতা প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে যায়; কারণ কেবলমাত্র তাঁদের মাধ্যমেই ইসলাম প্রচারিত হয়েছে।

সাহাবীগণের সততায় অবিশ্বাস করার অর্থ রাসূলুল্লাহ (ﷺ)–এর নবুওয়ত অবিশ্বাস করা। যারা মনে করেন যে, অধিকাংশ সাহাবী স্বার্থপর, অবিশ্বাসী বা ধর্মত্যাগী ছিলেন, তাঁরা নিঃসন্দেহে মনে করেন যে, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) একজন ব্যর্থ নবী ছিলেন (নাউযু বিল্লাহ!)। লক্ষ মানুষের সমাজে অজ্ঞাত অখ্যাত দু-চার জন মুনাফিক থাকা কোনো অসম্ভব বিষয় নয়। কিন্তু সুপরিচিত সাহাবীগণের সততায় সন্দেহ পোষণ করলে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)–এর ব্যর্থতার দাবি করা হয়। একজন ধর্ম প্রচারক যদি নিজের সহচরদের হৃদয়গুলিকে ধার্মিক বানাতে না পারেন, তবে তিনি কিভাবে অন্যদেরকে ধার্মিক বানাবেন! তাঁর আদর্শ শুনে, ব্যবহারিকভাবে বাস্তবায়িত দেখে ও তাঁর সাহচর্যে থেকেও যদি মানুষ ‘সততা’ অর্জন করতে না পারে, তবে শুধু সে আদর্শ শুনে পরবর্তী মানুষদের ‘সততা’ অর্জনের কল্পনা বাতুলতা মাত্র।

আজ যিনি মনে করেন যে, কুরআন পড়ে তিনি সততা শিখেছেন, অথচ মুহাম্মাদ (ﷺ)–এর কাছে কুরআন পড়ে, জীবন্ত কুরআনের সাহচর্যে থেকেও আবু বকর, উমার, উসমান, আবু হুরাইরা, আমর ইবনুল আস, মুআবিয়া, আবু মূসা আশআরী (রাঃ) বা অন্য কোনো সাহাবী সততা শিখতে পারেন নি, তিনি মূলত মুহাম্মাদ (ﷺ)–এর নবুওয়তকেই অস্বীকার করেন।

শীয়াগণ কাউকে দেবতা ও কাউকে দানব বানিয়েছেন। দুটি বিষয়ই মানবীয় প্রকৃতির সাথে সাংঘর্ষিক। মানবীয় দুর্বলতার সাথে সততার কোনো বৈপরীত্য নেই। সাহাবীগণ মানুষ ছিলেন; মানবীয় দুর্বলতার উর্ধ্বে ছিলেন না। মানবতার সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষকের সাহচর্যে মানুষের মধ্যে সর্বোচ্চ সততা ও বেলায়াত তাঁরা অর্জন করেছিলেন। কোনো স্কুলের সফলতা যেমন ছাত্রদের পাশের হারের উপর নির্ভর করে, তেমনি ধর্মপ্রচারকের সফলতা নির্ভর করে তাঁর সাহচর্য-প্রাপ্তদের ধার্মিকতার উপর। কাজেই নুবুওয়াতে বিশ্বাসের অনিবার্য দাবি সাহাবীগণের সততায় বিশ্বাস। আর এ বিশ্বাসই নিশ্চিত করেছে কুরআন ও হাদীস। এখানে সংক্ষেপে কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করছি:

(১) কুরআনে বারবার সাহাবীগণের প্রশংসা করা হয়েছে, তাঁদের ধার্মিকতার সাক্ষ্য দেওয়া হয়েছে এবং তাঁদেরকে

জান্নাতের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে। মক্কা বিজয়ের পূর্বের ও পরের সকল সাহাবীকে জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান করে আল্লাহ বলেন:

لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

“তোমাদের মধ্যে যারা (মক্কা) বিজয়ের পূর্বে ব্যয় করেছে এবং সংগ্রাম করেছে তারা এবং পরবর্তীরা সমান নয়; তারা মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ তাদের চেয়ে যারা পরবর্তীকালে ব্যয় করেছে এবং সংগ্রাম করেছে। তবে আল্লাহ উভয়কেই কল্যাণের (জান্নাতের) প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।”[1]

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) –এর সকল সাহাবীর ঢালাও প্রশংসা করে ও তাঁদের ধার্মিকতা, সততা ও বিশ্বস্ততার ঘোষণা দিয়ে মহান আল্লাহ বলেন:

وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ

“কিন্তু আল্লাহ তোমাদের নিকট ঈমানকে প্রিয় করেছেন এবং তাকে তোমাদের হৃদয়গ্রাহী করেছেন। তিনি কুফর, পাপ ও অবাধ্যতাকে তোমাদের নিকট অপ্রিয় করেছেন। তারাই সৎপথ অবলম্বনকারী।”[2]

(২) বিশেষত প্রথম অগ্রবর্তী মুহাজির ও আনসারগণের জন্য আল্লাহ জান্নাত প্রস্তুত রেখেছেন বলে ঘোষণা করা হয়েছে। নিষ্ঠার সাথে তাঁদের অনুসরণ করাই অন্যদের জন্য জান্নাতের পথ বলে জানানো হয়েছে:

وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

“মুহাজির ও আনসারদিগের মধ্যে যারা প্রথম অগ্রগামী এবং যারা নিষ্ঠার সাথে তাদের অনুসরণ করেছেন, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট। এবং তিনি তাদের জন্য প্রস্তুত করেছেন জান্নাত, যার নিম্নদেশে নদী প্রবাহিত, যেথায় তারা চিরস্থায়ী হবে। এ-ই মহাসাফল্য।”[3]

(৩) বাইয়াতুর রিদওয়ান ও তাবুক যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের জন্য আল্লাহর সন্তুষ্টির নিশ্চয়তা ও জান্নাতের সুস্পষ্ট সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন:

لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ

“মুমিনগণ যখন বৃক্ষতলে আপনার নিকট ‘বাইয়াত’ গ্রহণ করল, তখন আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হলেন।”[4]

তাবুক যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সকল সাহাবীর প্রশংসায় আল্লাহ বলেন:

لَكِنَّ الرُّسُولَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“কিন্তু রাসূল এবং যারা তার সংগে ঈমান এনেছে, তারা নিজ সম্পদ ও জীবন দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে; তাদের জন্যই কল্যাণ এবং তারাই সফলকাম।”[5]Anchor

(৪) মহান আল্লাহ কুরআনে প্রথমে মুহাজির এবং আনসারগণের উল্লেখ করে তাঁদের প্রশংসা করেন। এরপর পরবর্তী মুমিনদের বিষয়ে বলেন:

وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ

“তাদের পরে যারা আগমন করল তারা বলে, ‘হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদেরকে এবং ঈমানে অগ্রণী আমাদের পূর্ববর্তী ভ্রাতাগণকে ক্ষমা কর এবং মুমিনদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে হিংসা-বিদ্বেষ রেখ না। হে আমাদের প্রতিপালক, তুমি তো দয়াদ্র, পরমদয়ালু।’”[6]

এভাবে আমরা দেখছি যে, কুরআনের নির্দেশ অনুসারে পরবর্তী সকল প্রজন্মের মুমিনদের দায়িত্ব সকল আনসার ও মুজাহির সাহাবীর জন্য দু’আ করা এবং তাঁদেরকে অন্তর দিয়ে ভালবাসা। অন্তরে কোনো সাহাবীর প্রতি হিংসা বা বিদ্বেষভাব ঈমানের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়।

(৫) রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন :

أَكْرَمُوا أَصْحَابِي (فَإِنَّهُمْ خِيَارُكُمْ)، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَظْهَرُ الْكَذِبُ.

“তোমরা আমার সাহাবীগণকে সম্মান করবে; কারণ তাঁরাই তোমাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। তাঁদের পরে তাঁদের পরবর্তী যুগের মানুষেরা এবং এরপর তাঁদের পরবর্তী যুগের মানুষেরা। এরপর মিথ্যা প্রকাশিত হবে।”[7]

আবু হুরাইরা ও আবু সাদ্দ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন:

لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ

“তোমরা আমার সাহাবীগণকে গালি দেবে না। কারণ তোমাদের কেউ যদি উহদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণ দান করে তবুও সে তাদের কারো এক মুদ (প্রায় অর্ধ কেজি) বা তার অর্ধেক দানের সমপর্যায় পৌঁছাবে না।”[8]

কুরআন ও হাদীসের এ সকল নির্দেশনার আলোকে সাহাবীগণের বিষয়ে মুসলিমগণ নিম্নরূপ আকীদা পোষণ

করেন:

- (১) মানব জাতির মধ্যে নবীগণের পরেই সাহাবীগণের শ্রেষ্ঠত্ব এবং সাহাবীগণের মধ্যে খুলাফায়ের রাশেদীনের শ্রেষ্ঠত্ব।
- (২) খুলাফায়ে রাশেদীনের মধ্যে মর্যাদার তারতম্য তাঁদের খিলাফাতের দায়িত্বের ক্রম অনুসারে।
- (৩) অন্য সকল সাহাবীও মহান মর্যাদার অধিকারী। কোনো সাহাবীকেই কোনো মুমিন সামান্যতম অমর্যাদা বা অবজ্ঞা করেন না। তাঁদের কারো বিষয়েই কোনো অমর্যাদাকর কথা কোনো মুমিন কখনো বলেন না।
- (৪) সাহাবীগণের মধ্যে মতভেদ হয়েছে এবং কখনো কখনো যুদ্ধবিগ্রহ হয়েছে। ভুল বুঝাবুঝি, সামাজিক প্রেক্ষাপট, ষড়যন্ত্র ইত্যাদি বিভিন্ন কারণে দুজন সৎ ও নিষ্ঠাবান ব্যক্তির মধ্যে বিরোধ, মামলা বা যুদ্ধ হতে পারে। শুধু যুদ্ধ বা বিরোধের কারণে কাউকে অপরাধী বলা যায় না।

যুদ্ধবিগ্রহ ঐতিহাসিক সত্য। তবে সেগুলিতে কার কি ভূমিকা ছিল সে বিষয়ে কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব নয়। এ বিষয়ক ইতিহাস লেখা হয়েছে ঘটনার প্রায় ২০০ বৎসর পর শীয়া মতবাদ প্রভাবিত আববাসী শাসনামলে শীয়াগণের বর্ণনার উপর নির্ভর করে। কুরআন ও হাদীস সাহাবীগণের মর্যাদা ও সততা নিশ্চিত করেছে। এ সকল যুদ্ধবিগ্রহের অযুহাতে তাঁদের কারো নামে কুৎসা রটনা বা বিদ্বেষ পোষণ করার অর্থ কুরআন ও হাদীসের অগণিত নির্দেশনা জনশ্রুতির কারণে বাতিল করে দেওয়া।

কোনো কোর্টে যদি কোনো দলের নেতৃস্থানীয় কাউকে অপরাধী বলে রায় দেওয়া হয় তবে সে দলের অনুসারীরা রায়কে মিথ্যা বলবেন কিন্তু নেতার সততায় বিশ্বাস হারাবেন না। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ অতি-সাম্প্রতিক বিষয়। তারপরও সকলেই শুধু ইতিহাস বিকৃতির কথা বলেন। ঐতিহাসিকরা যদি কোনো নেতার অপরাধের অনেক তথ্য পেশ করেন তবুও তার অনুসারীরা সে তথ্য বিশ্বাস করবেন না। তাহলে মুমিন কিভাবে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) -এর সহচরদের বিষয়ে কুরআন প্রমাণিত সততার সাক্ষ্যের বিপরীতে ইতিহাসের বর্ণনার উপর নির্ভর করবেন?

আমরা শুধু এতটুকুই বলব যে, যুদ্ধ বিগ্রহ ঘটেছে, কিন্তু কার কী ভূমিকা তা আমরা এতদিন পরে ইতিহাসের বর্ণনার উপর নির্ভর করে নির্ধারণ করতে পারব না। তবে কুরআন ও হাদীসের বর্ণনার উপর নির্ভর করে আমরা তাঁদের পরিপূর্ণ সততা ও বেলায়াতে বিশ্বাস করি। আমরা মনে করি যে, তাঁদের যুদ্ধ-বিগ্রহ ইত্যাদি ভুল বুঝাবুঝি ও ইজতিহাদী মতপার্থক্যের কারণেই ঘটেছে। এতে তাঁদের তাকওয়া ও বেলায়াত (আল্লাহর ওলী হওয়ার মর্যাদা) ক্ষতিগ্রস্ত হয় নি।

উপরের বিষয়গুলোই ইমাম আবু হানীফা (রাহ) সংক্ষেপে উল্লেখ করেছেন। তিনি তাঁর “আল-ওয়াসিয়াহ” পুস্তিকায় এ বিষয়ে আরো বলেন:

وَنُقَرُّ بِأَنَّ أَفْضَلَ هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعْدَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ ﷺ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ، ثُمَّ عُمَرُ، ثُمَّ عُثْمَانُ، ثُمَّ عَلِيٌّ، رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: "وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ"، وَكُلُّ مَنْ كَانَ أَسْبَقَ فَهُوَ أَفْضَلُ، وَيُحِبُّهُمْ كُلُّ مُؤْمِنٍ تَقِيٍّ، وَيُبْغِضُهُمْ كُلُّ مُنَافِقٍ شَقِيٍّ.

“এবং আমরা স্বীকার ও বিশ্বাস করি যে, আমাদের নবী মুহাম্মাদ (ﷺ)–এর পরে এ উম্মাতের শ্রেষ্ঠতম আবু বাকর সিদ্দীক, অতঃপর উমার, অতঃপর উসমান, অতঃপর আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুম; কারণ আল্লাহ বলেছেন: “এবং অগ্রগামীগণ অগ্রবর্তীগণই তো অগ্রবর্তী, তারাই তো নৈকট্যপ্রাপ্ত, নিয়ামতপূর্ণ জালাতসমূহে”[9]। আর (সাহাবীগণের মধ্যে ইসলামগ্রহণে) যে যত বেশি অগ্রবর্তী তাঁর মর্যাদা তত বেশি। আর প্রত্যেক মুত্তাকী মুমিন তাঁদেরকে ভালবাসে এবং প্রত্যেক হতভাগা মুনাফিক তাঁদেরকে বিদ্বেষ করে।”[10]

অনেক সময় আবেগ-তাড়িত মুমিন পরবর্তী প্রজন্মের কোনো একজন প্রসিদ্ধ বুজুর্গের নেককর্মের আধিক্য দেখে তাকে কোনো সাহাবীর চেয়ে অধিক মর্যাদাশালী বলে মনে করতে থাকেন। এভাবে শীয়াগণ ও অন্য অনেকে তাবিয়ী উমার ইবন আব্দুল আযীয (রাহ)-কে সাহাবী মুআবিয়া ইবন আবী সুফিয়ান (রা) থেকে উত্তম বলে মনে করেছেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ)–এর প্রতি ঈমান ও ভালবাসার দুর্বলতা থেকে এরূপ ধারণার জন্ম হয়। মুমিনের ঈমানের দাবি যে, তিনি কোনোভাবেই রাসূলুল্লাহ (ﷺ)–এর সাহচর্যের সাথে কোনো নেককর্মের তুলনা করতে পারেন না। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ﷺ)–এর সাহচর্য, ঈমানের সাথে দু চোখ ভরে তাঁকে দেখা, তাঁর মুখের কথা শোনার বা তাঁর সাথে জিহাদে অংশ নেওয়ার চেয়ে অধিক মর্যাদার কর্ম কি আর কিছু হতে পারে? তাঁর সাহচর্যের মাধ্যমে ঈমান, তাকওয়া ও বেলায়াতের যে গভীরতা অর্জন হয় তা কি আর কোনোভাবে সম্ভব? আর মুমিনের আমলের মর্যাদা শুধু বাহ্যিক পরিমাপ দ্বারা হয় না, বরং ঈমান ও তাকওয়ার গভীরতাও এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। আর এজন্যই রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন: পরবর্তীদের উহুদ পাহাড় পরিমাণ বা লক্ষ লক্ষ টন সম্পদ দান সাহাবীগণের অর্ধ মুদ বা ২০০/৩০০ গ্রাম সম্পদ দানের সমকক্ষ হতে পারে না। আর এজন্যই পরবর্তী কোনো বুজুর্গ অনেক বেশি আমল করলেও মর্যাদায় কোনো অতি সাধারণ সাহাবীর সমকক্ষ হতে পারেন না। পরবর্তী কোনো প্রজন্মের কোনো বুজুর্গকে কোনো সাহাবীর সমকক্ষ বা উত্তম বলে মনে করলে মূলত রাসূলুল্লাহ (ﷺ) –এর এবং তাঁর সাহচর্যের অবমূল্যায়ন করা হয়।

এজন্য ইমাম আবু হানীফা (রাহ) কোনো তাবিয়ীকে বা অন্য কোনো বুজুর্গকে মুআবিয়া (রা) বা কোনো সাহাবীর সাথে তুলনা করার প্রবণতার প্রবল বিরোধিতা করেছেন। তিনি বলেন:

مقام أحدهم مع رسول الله ﷺ ساعة واحدة، خير من عمل أحدنا جميع عمره، وإن طال

“রাসূলুল্লাহ (ﷺ)–এর সাথে একজন সাহাবীর এক মুহূর্তের অবস্থান আমাদের আজীবনের আমলের চেয়েও উত্তম, আমাদের জীবন যতই দীর্ঘ হোক না কেন।”[11]

এ অর্থে অন্য এক বুজুর্গ বলেন:

غبار دخل في أنف معاوية مع رسول الله ﷺ أفضل من عمل عمر بن عبد العزيز

“রাসূলুল্লাহ (ﷺ)–এর সাহচর্যে মুআবিয়ার নাকের মধ্যে যে ধূলা প্রবেশ করেছে তাও উমার ইবন আব্দুল আযীযের আমলের চেয়ে উত্তম।”[12]

ইমাম আবু হানীফার আকীদা বর্ণনা প্রসঙ্গে চতুর্থ-পঞ্চম হিজরী শতকের প্রসিদ্ধ হানাফী ফকীহ বিচারপতি সায়িদ নাইসাপুরী (৩৪৩-৪৩২ হি) বলেন:

روي عن ابن المبارك رحمه الله قال: كنت عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - مع نوح بن أبي مريم، فقال، فقال: يا أبا حنيفة! إني قد كتبت هذه الكتب، وأريد أن أكتب من الآثار، فعمّن أحمل؟ فقال: عن كل عدل في هواه إلا الرافضة، فإن أصل عقدهم تضليل أصحاب النبي ﷺ. فضّل أبا بكر وعمر، وأحبّ علياً وعثمان، ولا تحمل الآثار عن لا يحبهم.

“আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারাক (রাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি আবু হানীফা (রহ.)-এর নিকট ছিলাম। আমার সাথে নূহ ইবন আবী মরিয়ম ছিলেন। তিনি দাঁড়িয়ে বললেন: হে আবু হানীফা, আমি তো এ সকল (ফিকহী) কিতাব লেখাপড়া করলাম। এখন আমি হাদীস শিক্ষা করতে চাই। কার নিকট থেকে হাদীস শিক্ষা করব? আবু হানীফা বলেন: সকল সৎ-বিশ্বস্ত মুহাদ্দিস থেকে হাদীস শিখবে, যদিও তার মধ্যে কিছু বিদআত থাকে। তবে শীয়া-রাফিযীদের থেকে কিছুই লেখা যাবে না। কারণ তাদের মতবাদের মূল ভিত্তি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সাহাবীগণকে বিভ্রান্ত বলে দাবি করা। তুমি আবু বকর (রা) ও উমার (রা)-কে সাহাবীগণের মধ্যে সর্বোত্তম বলে বিশ্বাস করবে এবং আলী (রা) ও উসমান (রা)-কে ভালবাসবে। যারা তাঁদেরকে ভালবাসে তারা ছাড়া আর কারো নিকট থেকে হাদীস শিখবে না।”[13]

সম্মানিত পাঠক, ইমাম আবু হানীফার এ কথাটি অনুধাবনের জন্য একটি বিষয় চিন্তা করুন। যদি ইহুদীদেরকে প্রশ্ন করা হয়: শ্রেষ্ঠ মানুষ কারা? তারা একবাক্যে বলবেন: আমাদের নবী মূসার (আঃ) সহচরগণ। যদি খৃস্টানদেরকে প্রশ্ন করা হয়: শ্রেষ্ঠ মানুষ কারা? তারা একবাক্যে বলবেন: আমাদের নবী ঈসার (আঃ) হাওয়ারী-সহচরগণ। আর যদি শীয়াদেরকে প্রশ্ন করা হয় নিকৃষ্ট-ঘৃণ্যতম মানুষ কারা? তবে তারা একবাক্যে বলবেন: আমাদের নবী মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর সহচরগণ!!

শীয়াদেরকে প্রশ্ন করুন: সবচেয়ে ভাল মানুষ কারা? তারা বলবেন: আলী (রা)-এর সাথীগণ। তাদেরকে প্রশ্ন করুন: সবচেয়ে খারাপ মানুষ কারা? তারা একবাক্যে বলবেন: মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর সাথীগণ!!

সম্মানিত পাঠক, কাউকে ভালবাসার অতি স্বাভাবিক প্রকাশ তার সাথে জড়িত সকলকে ভালবাসা ও সম্মান করা। এমনকি তাদের কোনো অপরাধ প্রমাণিত হলেও অজুহাত খুঁজে তা বাতিল করতে চেষ্টা করা। কারণ প্রিয়তমের সাথীদেরকে খারাপ কল্পনা করতে মন মানে না। আর কারো সঙ্গীসাথীকে সর্বোচ্চ ঘৃণা করার সুনিশ্চিত অর্থ ঐ ব্যক্তির প্রতি ভালবাসা না থাকা। কাজেই মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর সাথীদেরকে পথভ্রষ্ট প্রমাণ করা ও তাঁদেরকে ঘৃণা করা যাদের ধর্মের মূল ভিত্তি তাঁদের থেকে মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর হাদীস বা দীন শিক্ষা করা কি সম্ভব?

সাহাবীগণ বিষয়ে ইমাম আযমের আকীদা ব্যাখ্যা করে ইমাম তাহাবী বলেন:

وُحِبُّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَلَا نُفَرِّطُ فِي حُبِّ أَحَدٍ مِنْهُمْ؛ وَلَا نَتَّبَرُّ مِنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ، وَنُبْغِضُ مَنْ يُبْغِضُهُمْ، وَبِغَيْرِ الْخَيْرِ يَذْكُرُهُمْ، وَلَا نُذَكِّرُهُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ. وَحُبُّهُمْ دِينٌ وَإِيمَانٌ وَإِحْسَانٌ، وَبُغْضُهُمْ كُفْرٌ وَنِفَاقٌ وَطُغْيَانٌ. وَتُنْبِتُ

الْخِلَافَةَ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَوَّلًا لِأَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ فَضِيلًا لَهُ وَتَقْدِيمًا عَلَى جَمِيعِ الْأُمَّةِ، ثُمَّ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، ثُمَّ لِعُثْمَانَ، ثُمَّ لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَهُمْ الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ وَالْأَيُّمَةُ الْمَهْدِيُّونَ. وَإِنَّ الْعَشْرَةَ الَّذِينَ سَمَّاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَبَشَّرَهُمْ بِالْجَنَّةِ، نَشَّهَدُ لَهُمْ بِالْجَنَّةِ عَلَى مَا شَهِدَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَقَوْلُهُ الْحَقُّ، وَهُمْ: أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعُثْمَانُ، وَعَلِيٌّ، وَطَلْحَةُ، وَالزُّبَيْرُ، وَسَعْدُ، وَسَعِيدُ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، وَأَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ وَهُوَ أَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ. وَمَنْ أَحْسَنَ الْقَوْلَ فِي أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَزْوَاجِهِ الطَّاهِرَاتِ مِنْ كُلِّ دَنْسٍ، وَذُرِّيَّاتِهِ الْمُقَدَّسِينَ مِنْ كُلِّ رِجْسٍ؛ فَقَدْ بَرَأَ مِنَ النِّفَاقِ. وَعُلَمَاءُ السَّلَفِ مِنَ السَّابِقِينَ، وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ التَّابِعِينَ - أَهْلُ الْخَيْرِ وَالْإِثَرِ، وَأَهْلُ الْفِئَةِ وَالنَّظَرِ -، لَا يُذَكَّرُونَ إِلَّا بِالْجَمِيلِ، وَمَنْ ذَكَرَهُمْ بِسُوءٍ فَهُوَ عَلَى غَيْرِ السَّبِيلِ.

“আমরা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) -এর সাহাবীগণকে ভালবাসি। তাঁদের কারো ভালবাসায় সীমালঙ্ঘন করি না এবং তাঁদের কারো প্রতি অভক্তি বা সম্পর্কহীনতা ঘোষণা করি না। যারা সাহাবীগণকে বিদেষ করে বা ঘৃণা করে বা ভালভাবে ছাড়া তাঁদের উল্লেখ করে আমরা তাদেরকে ঘৃণা করি। আমরা তাঁদেরকে ভাল কথা ছাড়া উল্লেখ করি না। তাঁদেরকে ভালবাসা দীন, ঈমান ও ইহসান। আর তাঁদেরকে বিদেষ করা বা ঘৃণা করা কুফর, নিফাক ও অবাধ্যতা। আমরা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) -এর পর আবু বাকর সিদ্দিক (রা)-এর খিলাফত স্বীকার করি এবং তা সমগ্র উম্মতের উপর তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ও শীর্ষস্থানীয় হওয়ার কারণে। তারপর উমার ইবন খাত্তাব (রা), তারপর উসমান (রা) এবং তারপর আলী (রা)-এর খিলাফত স্বীকার করি। এরাই হলেন খুলাফায়ে রাশেদীন, (সুপথপ্রাপ্ত খলীফাবন্দ) ও আয়িম্মাহ মাহদিয়ীন (মাহদী ইমাম বা হিদায়াতপ্রাপ্ত ইমামবন্দ)। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যে দশজন সাহাবীর নাম উল্লেখ করে তাঁদের জান্নাতবাসী হওয়ার সুসংবাদ দান করেছেন আমার তাঁর এ সাক্ষ্যের ভিত্তিতে তাঁদের জান্নাতবাসী হওয়ার সাক্ষ্য প্রদান করি। কেননা, তাঁর উক্তি সত্য। এরা হলেন: আবু বাকর, উমার, উসমান, আলী, তালহা, যুবায়ের, সা'দ (ইবন আবী ওয়াক্কাস), সাঈদ (ইবন যাইদ ইবন আমর), আব্দুর রহমান বিন আ'ওফ এবং আবু উবায়দাহ বিন জাররাহ (রাঃ)। আর এ শেযোক্তজন এ উম্মতের আমীন (বিশ্বাসভাজন ব্যক্তি) হিসেবে আখ্যায়িত। আল্লাহ তাআলা তাঁদের সবাইর উপর সন্তুষ্ট হোন। যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) -এর সাহাবীগণ, তাঁর নিষ্কলুষ সহধর্মিনী ও পূত-পবিত্র নির্মল বংশধরগণ সম্পর্কে উত্তম মন্তব্য করলো সে নিফাক থেকে মুক্ত হলো। প্রথম যুগের ‘সালাফ সালিহীন’ (নেককার পূর্ববর্তীগণ) ও তাঁদের অনুসারী পরবর্তীকালের কল্যাণময় আলিমগণ, মুহাদ্দিস ও হাদীস অনুসারীগণ এবং ফকীহ-মুজতাহিদ ও ফিকহ-অনুসারীগণ, তাঁদের সকলকেই যথাযোগ্য সম্মান ও প্রশংসার সাথে স্মরণ ও উল্লেখ করতে হবে। আর যে ব্যক্তি তাঁদের সম্পর্কে কটুক্তি বা বিরূপ মন্তব্য করে সে ভ্রান্ত পথের অনুসারী।”[14]

ফুটনোট

[1] সূরা (৫৭) হাদীদ: ১০ আয়াত।

[2] সূরা (৪৯) হুজুরাত, ৭ আয়াত।

[3] সূরা (৯) তাওবা: ১০০ আয়াত।

[4] সূরা (৪৮) ফাৎহ: ১৮ আয়াত।

[5] সূরা (৯) তাওবা: ৮৮ আয়াত।

[6] সূরা (৫৯) হাশর: ১০ আয়াত।

[7] নাসাই, আস-সুনানুল কুবরা ৫/৩৮৭; মাকদিসী, আল-আহাদীসুল মুখতারাহ ১/১৯৩, ২৬৬, ২৬৮; তাহাবী, শারহ মা'আনীল আসার ৪/১৫০; মা'মার ইবনু রাশিদ, আল-জামি ১১/৩৪১; আবদ ইবনু হুইদ, মুসনাদ, পৃ: ৩৭। হাদীসটির সনদ সহীহ।

[8] বুখারী, আস-সহীহ ৩/১৩৪৩ (ফায়াইলু আসহাবিন নাবিয়্যি, বাবু কাওলিন নাবিয়্যি: লাও কুনতু মুত্তাখিয়ান....); মুসলিম, আস-সহীহ ৪/১৯৬৭ (কিতাব ফায়াইলিস সাহাবা, বাবু তাহরীমি সাবাবস সাহাবা)

[9] সূরা (৫৬) ওয়াকিয়া: ১০-১২ আয়াত।

[10] ইমাম আবু হানীফ, আল-ওয়াসিয়াহ, পৃ. ৭৭.

[11] মুওয়াফ্ফাক ইবন আহমদ মাক্কী (৫৬৮ হি), মানাকিবু আবী হানীফাহ, পৃষ্ঠা ৭৬।

[12] ইবন তাইমিয়া, মিনহাজুস সুন্নাতিন নববিয়াহ (কুরতুবা: শামিলা) ৬/১৪০।

[13] সাইদ নাইসাপুরী, আল-ইতিকাদ, পৃষ্ঠা ১৫৮।

[14] তাহাবী, আল-আকীদাহ, পৃ. ১৮-১৯।

Source — <https://www.hadithbd.com/books/link/?id=7191>

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন